সুলতান ইমাদুদ্দিন জিনকি

দ্য লিজেন্ড

মূল : আসলাম রাহি

ভাষান্তর : মুজিব তাশফিন

সম্পাদক : আবদুর রশীদ তারাপাশী

কালান্তর প্রকাশনী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

তিনি ছিলেন একজন সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়বিচারক বাদশাহ। আইন ও রাষ্ট্র শরয়ি বিধানের অনুগামী করতে এবং করাতে ছিলেন সচেষ্ট ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাঁর অধীনস্থদের ওপর কেউ অন্যায়-অবিচার করবে অথবা কারও ওপর বাড়াবাড়ি করবে—এ ছিল সবসময় তাঁর সহ্যের বাইরে।

সরকারি অফিসারদের উপর থাকত তাঁর কড়া দৃষ্টি। তাদের জন্য স্থাবর সম্পদ গড়ে তোলার অনুমতি ছিল না। সৈন্যদের উপর আদেশ ছিল—কোনো অবস্থায় যেন ফসলের ক্ষতি না হয়। কৃষকদের কাছ থেকে যেন বিনিময় ছাড়া কোনো জিনিস নেওয়া না হয়। তাঁর ন্যায়বিচারের দরজা ছিল সকলের জন্য উন্মুক্ত। ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফের ক্ষেত্রে মুসলিম এবং অমুসলিম সবাইকে তিনি একই চোখে দেখতেন।

একদিন এক ইয়াহুদি তাঁর কাছে এই মর্মে অভিযোগ নিয়ে আসে যে, আপনার প্রিয়পাত্র এক সেনাপতি আমার বাড়ি দখল করে নিয়েছে। ইয়াহুদি যখন অভিযোগ উত্থাপন করছিল তখন অভিযুক্ত সেনাপতিও ছিল বাদশাহর নিকটে। সত্যিই সে ছিল একজন প্রভাবশালী এবং সুলতানের প্রিয়ভাজনদের মধ্যে অন্যতম। সুলতান তাকে সম্মানও করতেন খুব। কিন্তু ইয়াহুদির অভিযোগ শুনে তিনি তার প্রতি এমন ক্ষুব্ধ ও ক্ষুধার্থ দৃষ্টিতে তাকান, যেন তাঁর চোখ থেকে আগুন ঠিকরে বের হচ্ছিল। সেনাপতি তখন চুপচাপ স্বস্থান ত্যাগ করে দখলকৃত বাড়িটা ইয়াহুদিকে বুঝিয়ে দিয়ে নিজের জন্য একটি তাঁবু টানিয়ে নেয়।

তিনি ছিলেন বাহাদুর, ন্যায়পরায়ণ ও উদার। তাঁর বদান্যতা এবং গরিবদের প্রতি আন্তরিকতার গুণে কতিপয় ঐতিহাসিক তাঁকে 'আবুস সাখাওয়াত' তথা 'উদারতার পিতা' উপাধি দিয়েছিলেন।

প্রতি শুক্রবার জুমআর নামাজের পূর্বে ১০০ দিনার দান করতেন এবং অন্যান্য দিনে তার আমির-উমারাদের মাধ্যমে বড় অঙ্কের অর্থ গরিব-মিসকিনসহ অপরাপর অভাবীদের মধ্যে বণ্টন করিয়ে দিতেন।

দিনের দু-বারই তাঁর দস্তরখানায় ওলামা, বিজ্ঞজন, বিচারক ও গরিবদের বিরাট একটি অংশ উপস্থিত থাকত। তিনি তাঁর কাজের লোকদের এই কথার ওপর সর্বদাই তাকিদ দিতেন যে, গরিব-মিসকিনদের প্রতি যেন বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। তাঁর এলাকায় কেউ যেন অভুক্ত ও বস্ত্রহীন না থাকে। তিনি যদি কখনো কোনো দুর্ঘটনা অথবা কোনো বিপদ থেকে বেঁচে যেতেন তাহলে তাৎক্ষণিক গরিব-মিসকিনদের মাঝে সাদাকাহ বিতরণ করে দিতেন।

একবার তিনি ভ্রমণের ইচ্ছায় শহরের বাইরে বের হলে পথিমধ্যে তাঁর ঘোড়ার পা পিছলে যায় এবং তিনি অল্পের জন্য উপুড় হয়ে পড়া থেকে বেঁচে যান।

সুলতান তখন তাঁর ভ্রমণসাথি জনৈক সৈন্যকে ডেকে তার কানে কানে কিছু বলতেই লোকটি ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে নিজ বাড়ি অভিমুখে রওয়ানা দেয়। অল্পক্ষণ পর সে ফিরে আসলে সুলতান তাকে জিজ্ঞস করেন, 'কী নিয়ে এসেছ?'

সে জবাব দেয়, 'সুলতান, মাত্র ১ হাজার দিনার পেয়েছি।' তিনি তখন তার কাছ থেকে দিনারগুলো নিয়ে গরিবদের মাঝে বিতরণ করে দেন।

বাস্তবতা ছিল—সুলতানের নিজস্ব কোনো কোষাগার ছিল না। যা পেতেন পুরোটাই গরিবদের মাঝে বিতরণ করে দিতেন। কিন্তু যখন কারও কাছ থেকে কিছু ধার করে গরিবদের মাঝে বিতরণ করতেন, দু-তিন দিনের ভেতরেই দ্রুত তা পরিশোধ করতেন। তিনি ছিলেন মুসলমানদের শ্রদ্ধা এবং সম্মানের পাত্র, কিংবদন্তি বীর, নির্ভিক ও তেজস্বী সুলতান ইমাদুদ্দিন জিনকি রাহ.।

সুলতান ইমাদুদ্দিন ছিলেন মুসলিম বিশ্বের সুপ্রসিদ্ধ বাদশাহ মালিক শাহ সালজুকের প্রিয়তম সৈনিক 'আক-সুনকুর আল হাজিব' ওরফে কাসিমুদ্দৌলাহর সন্তান। তাঁর পিতা ছিলেন জাতিতে তুর্ক। ছিলেন সুলতান মালিক শাহর অত্যন্ত প্রিয়ভাজন আমাত্যদের অন্যতম একজন। ইমাদুদ্দিন জিনকির পিতা কাসিমুদ্দৌলাহকে মালিক শাহ সালজুকি প্রথমে রাজপ্রাসাদের দেখাশোনার দায়িত্ব দেন। এর কিছুদিন পর তাঁকে 'হালাব'র গভর্নর নিযুক্ত করেন।

কাসিমুদ্দৌলাহ 'হালাব' শহর এমন সুচারুরূপে পরিচালনা করছিলেন যে, তাঁর পরিচালনায় মুগ্ধ হয়ে সুলতান সালজুকি শুধুমাত্র ধন্যবাদই দেননি; বরং

তাঁর কপালে চুমু খেয়ে নেন। মালিক শাহর ইনতেকালের পর তাঁর দুই ছেলে বারকিয়ারুক এবং নাসিরুদ্দিন মাহমুদের মাঝে সিংহাসন নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়। অন্যদিকে সুলতানের ভাই তাজুদ্দৌলাহও ক্ষমতা দখলের জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করতে থাকেন। তাজুদ্দৌলাহ তখন শাম এলাকার শাসক ছিলেন। তাজুদ্দৌলাহ তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে হালাব অভিমুখে বের হলে সুলতান ইমাদুদ্দিনের পিতা হালাব অধিপতি কাসিমুদ্দৌলাহ যখন দেখেন তাঁর নিকট যে ছোট বাহিনী রয়েছে, তা নিয়ে তাজুদ্দৌলাহর বিশাল বাহিনীর মোকাবিলা সম্ভব হবে না, তখন তিনি তাজুদ্দৌলাহর সঙ্গ দিতে রাজি হয়ে যান।

তাজুদ্দৌলাহ তাঁর সৈন্যদলসহ দ্রুত সুলতান বারকিয়ারুকের এলাকার দিকে অগ্রসর হয়ে বেশ কিছু এলাকা নিজের কব্জায় নিয়ে নেন। অন্যদিকে মালিক শাহর ছেলে বারকিয়ারুক; যাকে ইমাদুদ্দিন জিনকির পিতা কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছিলেন তিনিও তাজুদ্দৌলাহর মোকাবিলায় প্রস্তুতি শুরু করে দেন।

তাজুদ্দৌলাহ তাঁর বাহিনী নিয়ে বিভিন্ন এলাকা বিজয় করে যখন আজারবাইজান প্রবেশ করেন ততক্ষণে বারকিয়ারুক তাঁর যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে তাজুদ্দৌলাহর মোকাবিলায় বেরিয়ে আসেন। অতঃপর যখন উভয় সৈন্যদল পরস্পরে মুখোমুখি হয় এবং ইমাদুদ্দিনের পিতা কাসিমুদ্দৌলাহ দেখতে পান, তাঁর মোকাবিলায় রয়েছেন তদীয় মুরব্বি সুলতান মালিক শাহ সালজুকির ছেলে বারকিয়ারুক; তখন তাঁর অনুগ্রহকারীর ভাইয়ের পক্ষ হয়ে পুত্রের বিরোধিতায় ময়দানে নেমে আসতে তাঁর বিবেক সায় দেয়নি। তিনি তাজুদ্দৌলাহর সঙ্গ ছেড়ে বারকিয়ারুকের সাথে গিয়ে মিলিত হন।

কাসিমুদ্দৌলাহ বাহিনীসহ সঙ্গ ত্যাগ করলে তাজুদ্দৌলাহর শক্তি খর্ব হয়ে আসে। সুতরাং তিনি যুদ্ধের ইচ্ছে বাদ দিয়ে বাহিনী নিয়ে দামেশকে ফিরে যান। কেননা, তিনি ছিলেন দামেশকের শাসনকর্তা।

যুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে তাঁর সঙ্গত্যাগ এবং প্রতিপক্ষ বারকিয়ারুকের সঙ্গ দেওয়ার দরুন তাজুদ্দৌলাহ কাসিমুদ্দৌলাহর উপর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। তাই দামেশক পৌঁছেই তিনি বিরাট আকারের যুদ্ধপ্রস্তুতি শুরু করে দেন।

প্রস্তুতি শেষে তাজুদ্দৌলাহ কাসিমুদ্দৌলাহ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্তে দামেশক থেকে হালাব অভিমুখে বেরিয়ে পড়েন।

বারকিয়ারুক তাজুদ্দৌলাহর এই অগ্রযাত্রার সংবাদ পেলে কাসিমুদ্দৌলাহর সাহায্যার্থে তাঁর বড় মাপের তিনজন সেনাপতিকে হালাবের দিকে পাঠিয়ে দেন। বারকিয়ারুক কর্তৃক প্রেরিত সেনাপতিদের মধ্যে একজনের নাম ছিল আমির কারবুকা, দ্বিতীয়জন তাঁর ভাই আলতুন তাশ, তৃতীয়জনের নাম ছিল বাজান।

হালাবের উপকণ্ঠে কাসিমুদ্দৌলাহ এবং তাজুদ্দৌলাহর মাঝে বিরাট যুদ্ধ সংগঠিত হয়। কিন্তু তাজুদ্দৌলাহর সৈন্যদল অপেক্ষা কাসিমুদ্দৌলাহর সৈন্যদল নিতান্তই ছোট্ট ছিল; বিধায় যুদ্ধে তাঁরা পরাজিত হন এবং কাসিমুদ্দৌলাহসহ উক্ত সেনাপতিত্রয়ও তাজুদ্দৌলাহর বাহিনীর হাতে বন্দি হয়ে যান।

বলা হয়, যখন কাসিমুদ্দৌলাহকে তাজুদ্দৌলাহর সামনে উপস্থিত করা হয় তখন তাজুদ্দৌলাহ তাঁকে লক্ষ করে প্রশ্ন করেন—

'যুদ্ধে তুমি বিজয় লাভ করলে আমার সাথে কী আচরণ করতে?'

কাসিমুদ্দৌলাহ ভীতু ছিলেন না, তিনি তাৎক্ষণিক সিনা টান করে উঁচু আওয়াজে বলেন, 'আমি তোমাকে হত্যার আদেশ দিতাম; যাতে ফিতনা-ফাসাদের গোড়া কর্তন হয়ে যায়।'

জবাব শুনে তাজুদ্দৌলাহ বলেন, 'আমিও তোমার ব্যাপারে একই আদেশ দিলাম।' এভাবেই সে কাসিমুদ্দৌলাহকে হত্যা করে ফেলে।

কাসিমুদ্দৌলাহর হত্যার সময় ইমাদুদ্দিন জিনকির বয়স ১২ থেকে ১৪ বছরের মাঝামাঝি ছিল। তিনি ছিলেন পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। পিতার সাথে তিনিও যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত ছিলেন। যখন তাঁর পিতা পরাজয় বরণ করেন এবং তাঁকে হত্যা করে ফেলা হয়, তখন তিনি সেখান থেকে পালিয়ে আসেন।

ছোট্ট ইমাদুদ্দিন তখন বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে হালাব থেকে পলায়ন করে সোজা সুলতান বারকিয়ারুকের দরবারে চলে আসেন।

বারকিয়ারুক তাঁর মাথায় অনুগ্রহের হাত রাখেন এবং তাঁকে নিজ সেনাদলে অন্তর্ভুক্ত করে নেন। এরপর সুলতান বারকিয়ারুক এবং দামেশক অধিপতি তাজুদ্দৌলাহর মধ্যে বেশ ক'বার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। প্রথম দিকে তাজুদ্দৌলাহর পাল্লা ভারি ছিল। কিন্তু সবশেষে 'রায়' শহরের নিকটে একটি সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এই যুদ্ধে বারকিয়ারুকের কাছে তাজুদ্দৌলাহর বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে এবং তার সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। খোদ তাজুদ্দৌলাহ নিজেও গ্রেফতার হয়।

তখন জিনকির পিতা কাসিমুদ্দৌলাহর ভক্ত জনৈক সৈনিক কাসিমুদ্দৌলাহর হত্যার প্রতিশোধস্বরূপ তাজুদ্দৌলাহকে হত্যা করে ফেলে।

সুলতান বারকিয়ারুক এবং তাজুদ্দৌলাহর মাঝে যেসব যুদ্ধ সংগঠিত হয় সবগুলোতেই ইমাদুদ্দিন জিনকি সুলতান বারকিয়ারুকের সঙ্গ দেন। তাজুদ্দৌলাহ মারা যাবার পর তার পুত্র রেজওয়ান শামের শাসক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সুন্দর মনের অধিকারী একজন মানুষ। সিংহাসনে আরোহণ করার পরপরই তিনি বারকিয়ারুকের আনুগত্য স্বীকার করে নেন। সুলতান তাঁর নিঃশর্ত আনুগত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর পিতার কাছ থেকে যেসব এলাকা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন সেগুলোর পাশাপাশি হালাবও তাঁর শাসনে ফিরিয়ে দেন; যাতে তিনি খুশি হয়ে যান।

সুলতান বারকিয়ারুক তখন রেজওয়ানকে বলেন, 'তোমার পিতা আমার বড় মাপের দুজন সেনানায়ক কারবুকা এবং আলতুন তাশ এবং বাজানকে গ্রেফতার করে কয়েদখানায় বন্দি করে রেখেছিলেন। আমি চাই তাদের মুক্তি দেওয়া হোক।' সুলতান বারকিয়ারুকের এই আদেশ পাওয়ামাত্র শামের নতুন শাসক রেজওয়ান তাদের মুক্ত করে দেন।

কয়েদখানা থেকে মুক্ত হয়েই কারবুকা একটি বিরাট কাজ করেন। তিনি ছিলেন ইমাদুদ্দিন জিনকির পিতা কাসিমুদ্দৌলাহর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। কয়েদখানা থেকে মুক্ত হওয়ার পর একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলেন এবং যথাক্রমে হাররান ও মসুলের ওপর আক্রমণ করে শহর দুটো কব্জা করে নেন।

তাঁর এই কৃতিত্বে মুগ্ধ সুলতান বারকিয়ারুক তাঁকে মসুলের অধিপতি হিসেবে ঘোষণা করেন। যেহেতু কারবুকা ছিলেন ইমাদুদ্দিন জিনকির পিতা কাসিমুদ্দৌলাহর পুরনো বন্ধু, তাই তিনি সুলতান সমীপে অনুরোধ করেন—

ইমাদুদ্দিনকে যেন তাঁর নিকট সোপর্দ করে দেওয়া হয়; যাতে তিনি নিজে তাঁর শিক্ষা-দীক্ষার উত্তম ব্যবস্থা করতে পারেন।

সুলতান বারকিয়ারুক আমির কারবুকার এই ইচ্ছের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ইমাদুদ্দিনকে কারবুকার নিকট সোপর্দ করে দেন।

কারবুকা ইমাদুদ্দিনের উত্তম শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং জীবনধারণের ব্যবস্থাস্বরূপ তাঁর নামে কিছু জায়গিরও বরাদ্দ করে দেন।

এভাবেই কারবুকা উত্তম পদ্ধতিতে বন্ধুত্বের হক আদায় করেন। আমির কারবুকার একনিষ্ঠ আন্তরিকতা, স্নেহমমতা এবং অভিভাবকত্বের ছোঁয়ায় ইমাদুদ্দিন নিজের আলোকিত ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তৈরি করে নেন। একপর্যায়ে আমির কারবুকা স্বীয় সৈন্যবাহিনী নিয়ে যখন আমেল শহরে আক্রমণ করেন, তখন তিনি ইমাদুদ্দিনকে তাঁর সৈন্যের একটি অংশের সেনাপতি নির্ধারণ করেন। এটাই ছিল কোনো যুদ্ধে দায়িত্বশীল হয়ে অংশগ্রহণ করা ইমাদুদ্দিনের প্রথম অভিজ্ঞতা। উক্ত যুদ্ধে তিনি এমন দুঃসাহস ও বীরত্বের সাথে লড়াই করেন যে, শত্রু-মিত্র সকলেই তাঁর বীরত্ব এবং সাহসের প্রশংসা করতে থাকে।

বলা হয়, ওই যুদ্ধে আমির কারবুকা এবং ইমাদুদ্দিন শত্রুকে এমন নির্মমভাবে পরাজিত করেন যে, কারবুকা শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে স্বীয় সৈন্যদল থেকে পৃথক হয়ে যান এবং দুশমনের ঘেরাওয়ের মাঝে পড়ে যান। সেই নাজুক মুহূর্তে যখন কারবুকার মাথার ওপর মৃত্যু চক্রাকারে ঘুরছিল, আচমকা ইমাদুদ্দিন বিদুৎ-ক্ষিপ্রগতিতে কারবুকার সাহায্যে ওখানে পৌঁছে যান এবং তাঁর অধীন সৈন্যদের সাথে নিয়ে শত্রুদের ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েন যে, তাদের কচুকাটা করে সামনে এগিয়ে কারবুকাকে শত্রুর বেষ্টনী থেকে নিরাপদে বের করে নিয়ে আসেন।

এরপর তাঁর উৎসাহ এতটা বৃদ্ধি পায় যে, তিনি তাঁর অধীনস্থ সৈন্যদের নিয়ে আমেল শহরে হামলা করে শহরপ্রাচীরের একটা অংশ ভেঙে শত্রুদের যাবতীয় প্রতিরোধ চূর্ণবিচূর্ণ করে প্রাচীর-শীর্ষে বিজয়ের পতাকা উড্ডীন করে নেন। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কারবুকা এবং সুলতান বারকিয়ারুকের দৃষ্টিতে ইমাদুদ্দিনের মর্যাদা ও সম্মান পূর্বের থেকে কয়েকগুণ বেড়ে যায়।

কালের নিদারুন পরিহাস, কিছুদিন পর আমির কারবুকা ইনতেকাল করেন। তাঁর পরে মুসা তুর্কিমানি মসুলের শাসক নিযুক্ত হন। কিন্তু কয়েকমাসের ব্যবধানে তিনিও এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে চলে যান এবং জারকামিশ নামক জনৈক সেনাপতি মসুলের কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেয়। মসুলের নতুন শাসক জারকামিশ পূর্ব থেকেই ইমাদুদ্দিনকে পছন্দ করতেন এবং নিজ সন্তানের মতো তাঁকে আদর ও মর্যাদা দিতেন। আমির জারকামিশ মসুলের শাসনভার গ্রহণ করা মাত্রই তাঁর ছেলে গিয়াসুদ্দিনের মেয়ের সাথে ইমাদুদ্দিনের বিয়ে করিয়ে দেন এবং একটি দামি জায়গিরও তাঁর নামে বরাদ্দ করেন। এ সময় ইমাদুদ্দিনের সবচেয়ে হিতাকাঙ্ক্ষী এবং সাহায্যকারী বারকিয়ারুকের ইনতেকাল হয়ে যায়। তাঁর স্থলে সুলতান গিয়াসুদ্দিন বিন মালিক শাহ ইরান ও ইরাকের শাসক হন।

এ সময় মসুলের পরিস্থিতি নাজুক হয়ে আসলে ইমাদুদ্দিন মসুল থেকে অন্যত্র হিজরত করে চলে যান। কিন্তু তাঁর সৌভাগ্য যে, স্বল্প সময়ের মধ্যেই আমির মওদুদ নামক জনৈক আমির মসুলের ওপর বিজয় লাভ করেন, তিনিও ইমাদুদ্দিনকে পছন্দ করতেন। তাই ইমাদুদ্দিন পুনরায় মসুল প্রত্যাবর্তন করেন এবং আমির মওদুদের বাহিনীতে যোগ দেন।

আমির মওদুদ এবং ইমাদুদ্দিন উভয়ে মিলে নিজেদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করেন। সময়টা ছিল মুসলিম উম্মাহর জন্যে বড় একটা ক্রান্তিকাল। কারণ, ইরাক, ইরান, ফিলিস্তিন ও শামের শাসকদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য এবং সহযোগিতার অভাব ছিল প্রকট। তাদের সবাই ছিলেন একে অপরের ওপর প্রভাব বিস্তারে ব্যস্ত। এ সুযোগে ইউরোপের খ্রিষ্টানরা আক্রমণ চালিয়ে মুসলমানদের বিভিন্ন শহর ছিনিয়ে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে নিচ্ছিল।

ইমাদুদ্দিন জিনকি যখন শৈশব পেরিয়ে যৌবনে উপনীত, তখন মুসলিম জাতি ঘোর অন্ধকারে জীবন অতিবাহিত করছিল। খ্রিষ্টানদের কারণে শাম, ইরাক ও ইরান মুসলমানদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠছিল। ওদের হাতে মুসলমানদের জান-মাল এবং ইজ্জত-আবরুর কোনোই নিরাপত্তা ছিল না। কেননা, বিগত কয়েক বছরে ইউরোপের আক্রমণকারীরা এতদঞ্চলে মুসলমানদের বিস্তৃত এলাকা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে গিয়েছিল। মুসলমানদের বড় বড় শহরসমূহ যেমন : উদায়সা, এন্তাকিয়া, বায়তুল